স্বাধীনতার পর

৪৮ বছরে শিক্ষাঙ্গনে ২৫৩ জনের মৃত্যু

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বুধবার, ১৬ অক্টোবর ২০১৯

স্বাধীনতার পর গত ৪৮ বছরে সারাদেশের ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর সহিংসতায় ২৫৩ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রলীগের সর্বোচ্চ ৬১ জন, ছাত্রদলের ৩৯ জন এবং বাকি ১৫৩ জন সাধারণ শিক্ষার্থী ও অন্যসব সংগঠনের কর্মী।

স্বাধীনতার পর এক-দেড় বছর দেশের ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সহিংসতা খুব একটা ঘটেনি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত দেশের ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই বিরাজ করেছিল। '৭৩ সালে কয়েকটি ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও কেউ মারা যায়নি। অর্ধশত শিক্ষার্থী আহত হয়েছিল। কিন্তু '৭৪ সালে ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরতে শুরু হয়। '৭৪ সালের ৪ এপ্রিল গভীর রাতে মুহসীন হলে একসঙ্গে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী ও যুবককে হত্যা করা হয়। পরে আদালতের রায় অনুযায়ী '৭৫ সালে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতার যাবজ্জীবন সাজা

হয়। সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে তারা ছাড়া পান।

’৯০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রহত্যা অব্যাহত থাকে। ’৭৪ থেকে ’৯০ সাল এই ১৮ বছরে দেশের শিক্ষাঙ্গনে নিহত হয় মোট ৯২ জন শিক্ষার্থী। ৯২ জনের মধ্যে ছাত্রলীগের ১৬ জন, ছাত্রদলের ছয়জন এবং বাকিরা ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যসব সংগঠনের নেতাকর্মী। এ সময়ে বিভিন্ন সংঘর্ষে আহত হয় ২ হাজার ৮৪৭ জন।

পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত ২৮ বছরে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত হয় আরও ১৬১ জন শিক্ষার্থী। এই সময়ে আহত হয় আরও ১৬ হাজার ১৮২ জন। এই সময় ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালনকালে সহিংসতার শিকার হয়ে আহত হন ১৩৬ জন পুলিশ সদস্য এবং ৮২ জন গণমাধ্যমকর্মী। সবমিলিয়ে ৪৮ বছরে শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতায় মৃত্যু হয় ২৫ জনের। বেশিরভাগ হত্যার কোন বিচার হয়নি।

সংবাদসহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সহিংসতার বিস্তার ঘটে সাবেক স্বৈরশাসক এইচএম এরশাদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে। জেনারেল এরশাদের আট বছরের সামরিক শাসনামলের শেষ দিকে ক্যাম্পাসে সহিংসতা ব্যাপক রূপ নেয়। এরশাদের পতনের পর

বিএনাপ ক্ষমতায় আসলে ক্যাম্পাসে সাহংসতা আরও বেড়ে যায়। ব্যাপক রক্তপাতও ঘটে।

১৯৮৯ সালে ক্যাম্পাসে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটে ৬৮টি। এরমধ্যে ১৯টি সংঘর্ষে নিহত হয় ২০ জন। ৪৪টি সংঘর্ষে আহত ৫৯৫ জন। ওই বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি ডাকসুর বিজয় মিছিলে ছাত্রীদের ওপর হামলা হয়।

১৯৯০ সালে দেশের শিক্ষাঙ্গনে ৬৮টি ছাত্র সংঘর্ষ হয়। নিহত হয় ৫ জন। আহত হয় শতাধিক। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে সারাদেশে ছাত্র সংঘর্ষ হয় ২০৮টি। এসব সংঘর্ষে নিহত হয় ২৪ জন এবং আহত হয় ২ হাজার ৩০ জন। ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

তৎকালীন জাতীয় পত্রিকার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে আবাসিক হল দখল, ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তার, টেন্ডারবাজি, সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের অন্তর্কোন্দল, দুই দলের মধ্যে রেষারেষি। সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষে জড়িয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ‘ইসলামী ছাত্রশিবির’, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্রলীগ’, সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠা করা দল বিএনপি’র ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্রদল’। হতাহতের সংখ্যায়ও এই তিন সংগঠনের নেতাকর্মী বেশি।

গত ২৮ বছরে নিহত ১৬১ জনের সাংগঠনিক পরিচয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে ছাত্রলীগের ৪৫ জন কর্মী, ছাত্রদল কর্মী ৩৩ জন নিহত ও ছাত্রশিবির কর্মী ২২ জন। নিহত অন্যদের মধ্যে ন্যূনতম আটজন সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মী। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সবচেয়ে বেশি মেয়াদে (পাঁচ মেয়াদ চলমান) সরকার ক্ষমতায় থাকলেও ক্যাম্পাস সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। এসব হত্যাকাণ্ডের বেশিরভাগের কোন বিচার হয়নি।

ক্যাম্পাসে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল’ (বিএনপি) সরকারের প্রথম মেয়াদে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালে। ওই পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ হারায় ৭৫ জন, যাদের বেশিরভাগই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। আহত হয় আরও প্রায় সাড়ে তিন হাজার। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা অনেকটাই কমে আসে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম আমলে ১৯৯৬-২০০১ সালে পাঁচ বছরে শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতায় নিহত হয় ৩০ জন এবং আহত হয় দুই হাজার ৩২৮ জন।

এরপর বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ২০০১ সালে সরকার গঠন করলে ফের অস্থির হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। বেপরোয়া হয়ে ওঠে

ছাত্রাশাবর। শিবিরের কর্মীরা প্রতিপক্ষ কর্মীদের হাত-পায়ের রগ কাটার সংস্কৃতি চালু করে। এদের বর্বরতায় ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল অনেক কর্মী নিহত ও পঙ্গু হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে হলছাড়া করে ছাত্রশিবির। এই সহিংসতায় আহত হয় তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। নিহত হয় ১৭ জন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতা এলে পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে প্রাণ হারায় ২২ জন এবং আহত হয় চার হাজারের বেশি শিক্ষার্থী।

শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে ছাত্রদল। তবে স্বরূপেই ছিল ছাত্রশিবির। এ পাঁচ বছরে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন সংঘর্ষে নিহত হয় ৪ জন এবং আহত হয় প্রায় দেড় হাজার। ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে নিহত হয় ৯ জন এবং আহত হয় দেড় হাজার শিক্ষার্থী।

আওয়ামী লীগ সরকারের ২০১৪-১৮ মেয়াদে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সহিংসতা কিছুটা কমই ছিল। ওই পাঁচ বছরে শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন সহিংসতায় নিহত হয় ১৪ জন এবং এক হাজার ৬৪৯ জন আহত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদে (২০১৯-চলমান) ক্যাম্পাসে নিহত হয়েছেন একজন (বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ)। এই মেয়াদে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আহত হয় ৪১৪ জন।

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষাঙ্গনে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রক্তপাতের ঘটনাও এখানে বেশি। ১৯৯১-৯২ ও '৯৩ সালে তিন বছরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৬৪৪টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় নিহত হয় ৮৯ জন, আহত হয় ছয় হাজার ৮৪২ জন এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় ১৬২ বার।

এই তিন বছরে সবচেয়ে বেশি সহিংসতা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১০৮টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হয় ১৭ জন, আহত হয় ৩৩০ জন এবং তিনবার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

প্রাণের অপচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৯৯৩ সালের ১৮ অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর ঢাবি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কয়েকশ' সংঘর্ষ এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হয়।

স্বাধীনতার পর ঢাবিতে প্রথম চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে '৭৪ সালের ৪ এপ্রিল। গভীর রাতে মুহসীন হলে একসঙ্গে ৭ জন যুবককে হত্যা করা হয়। পরে আদালতের রায় অনুযায়ী '৭৫ সালে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধানসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতার যাবজ্জীবন সাজা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে তারা ছাড়া পান।

'৭৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে চার যুবক নিহত হয়। '৭৭ সালে ইনু ও গোগা নামে দুই যুবককে

সূর্যসেন হলে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই সময় আওরঙ্গের এক ভাই রনুট নিহত হয় লুকু গরুপের হাতে। এ ঘটনার জের ধরে '৭৮ সালে লিয়াকতকে হত্যা করা হয়।

১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মুহসীন হল ও জহুরুল হক হলের মাঝামাঝি এলাকায় হত্যা করা হয় বাকশাল সমর্থক জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়াকে। স্বৈরাচার এরশাদ সমর্থক তৎকালীন নতুন বাংলা ছাত্রসমাজের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বসুনিয়াকে হত্যা করে।

১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ হত্যা করা হয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী মাজহারুল হক আসলামকে।

'৮৭ সালের ৯ মার্চ দুপুরে মুহসীন হলের একটি কক্ষে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ছাত্রদলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু। এ ঘটনায় মাঈনুদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ নামের দু'যুবকও নিহত হয়।

একই বছরের ১৪ জুলাই মধ্যরাতে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় ছাত্রদল কর্মী আবদুল ওয়াদুদ হালিম। পরদিন জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হবার চারদিন পর মারা যায় মুন্না নামের এক যুবক। এ সংঘর্ষে রিকশাচালক আবদুর রহিম ক্রসফায়ারে পড়ে ঘটনাস্থালেই মারা যান। এ সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদল নেতা নীরু, অভি, ইলয়াস, রতনসহ ১১ জনকে ঢাবি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

'৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর রাত ৮টায় ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মুহসীন হলে হত্যা করা হয়

সংগঠনের নেতা বজলুর রহমান শহীদকে (পাগলা শহীদ)।

’৮৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিক ডাকসু নির্বাচনের উত্তেজনার জের হিসেবে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় জাসদ ছাত্রলীগ নেতা কফিলউদ্দিন কনক।

’৮৯ সালের ৯ নভেম্বর রাতে সলিমুল্লাহ হলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় মার্কেটিং বিভাগের মেধাবী ছাত্র আরিফ।

’৯০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা ও জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি শহীদুল ইসলাম চুন্নু। পরবর্তীতে ২৬ নভেম্বর অভি গরুপের গুলিতে আণবিক শক্তি কমিশনের সামনে নিহত হয় নিমাই নামে এক তরুণ চা দোকানদার। পরদিন ২৭ নভেম্বর টিএসসির সামনে বিএমএ নেতা ডা. শামসুল আলম মিলন নিহত হন।

’৯১ সালের ২১ জানুয়ারি সূর্যসেন হলের ছাত্র আলমগীর কবীর লিটন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। পরবর্তীতে ২০ জুন জাসদ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুর রহমান মাহবুব। এ বছরের ২৭ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা মির্জা গালিব ও লিটন এবং ছাত্রলীগ নেতা মিজান। এ সংঘর্ষে একজন অজ্ঞান পরিচয় টোকাইও নিহত হয়।

’৯২ সালের ৯ জানুয়ারি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। পরবর্তীতে ১৩ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মঈন হোসেন রাজু ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়। ২৭ জুন রাতে জহুরুল হক হলে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় ছাত্রলীগ কর্মী লাকুক। ৩০ আগস্ট ছাত্রদলের ইলিয়াস গ্রুপ ও রতন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি নিহত হন। ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ইলিয়াস গ্রুপ ও রতন গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা মামুন ও মাহমুদ।

এসব মৃত্যুর পাশাপাশি স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ঢাবি ক্যাম্পাসে ‘অরাজনৈতিক’ হত্যাকাণ্ডও ঘটেছে। ’৮০-৮১ সালের দিকে সলিমুল্লাহ হলের বাইরে ক্যান্টিনের কাছে হত্যা করা হয় ভূতের গলির এক যুবককে। ’৮২ সালের দিকে শামসুন্নাহার হলের কাছে ও সলিমুল্লাহ হলের বাইরের মাঠে অজ্ঞাত পরিচয় দুই যুবকের লাশ পাওয়া যায়। ’৮৩ সালে মুহসীন হলে কাঁচপুর ব্রিজ এলাকার এক যুবককে হত্যা করা হয়। ’৯১ সালের মার্চে জহুরুল হক হলে বহিরাগত এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ’৯৩ সালে ছাত্রদলের অন্তর্কলহে মারা যায় পাভেল ও জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ। ছাত্রলীগের একাংশের কোন্দলে মারা যায় অলক নামের এক ব্যক্তি।